আমি তো মরা কাঠ নই, জ্যান্ত গাছ

অনুলিখন: মলয় ভট্টাচার্য ও অরিন্দম বর্ধন
টীকা সংযোজন: মলয় ভট্টাচার্য

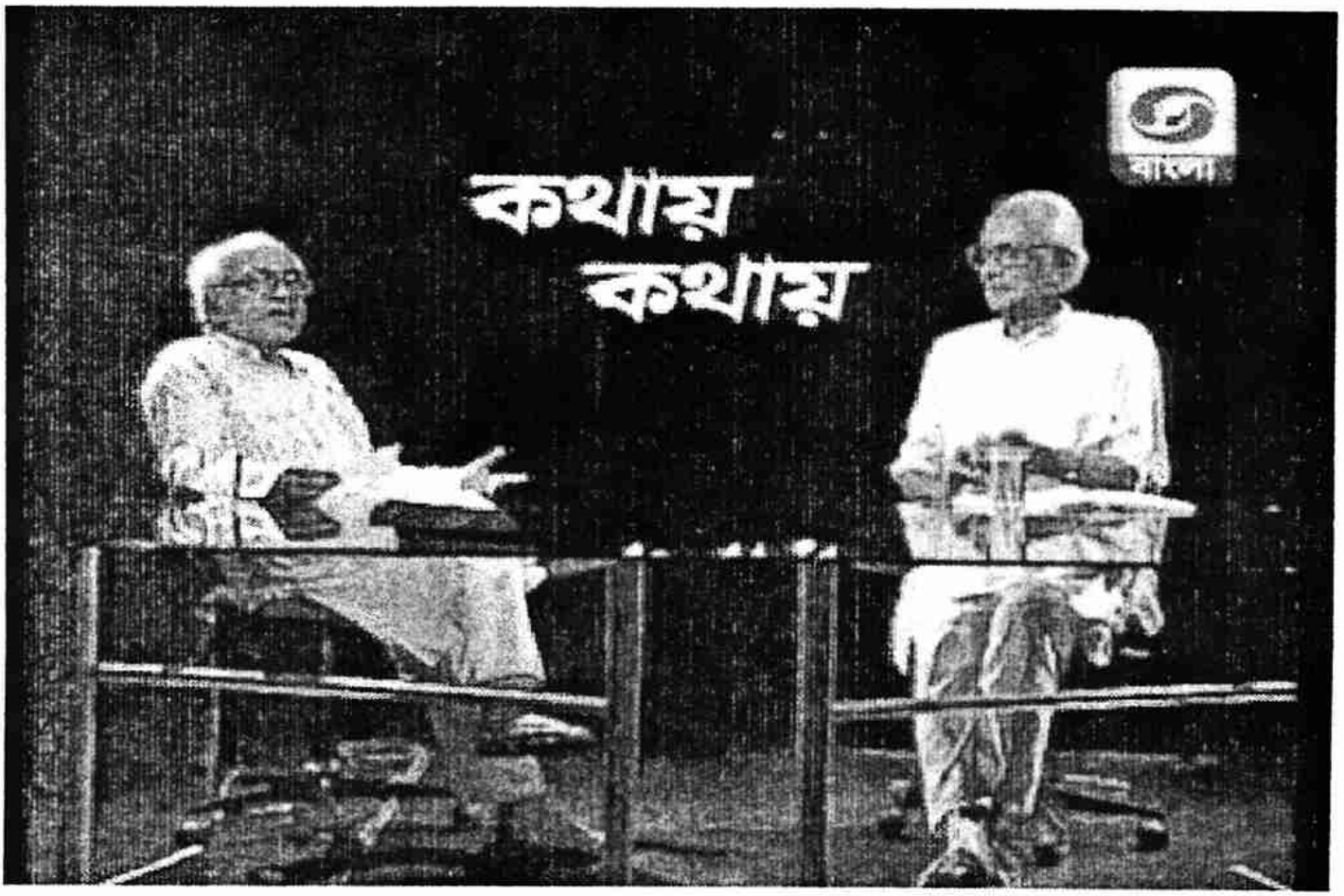

[আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে দূরদর্শন-বাংলায় "কথায় কথায়" নামে অনুষ্ঠানের জন্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। টেলিভিশনের দর্শকদের সঙ্গে দূরভাষে নানাবিধ প্রশ্নোত্তর সহযোগে দু'দিন ধরে সেই সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হয়। "কথায় কথায়"-এর এই পর্বটি, বিশেষভাবে নীরেন্দ্রকাব্যপ্রেমীদের মনে, সেদিন খুব সাড়া ফেলেছিল স্বভাবতই। এবং পরবর্তীকালেও অনেকে এই সাক্ষাৎকারের কথা নীরেন্দ্রনাথের কবিতার নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, শুনেছি। উক্ত সাক্ষাৎকারটি থেকেই অনুলিখন ও অবশ্যম্ভাবী কিছু সম্পাদনার শেষে একটি মান্যপাঠ নির্মাণের পর, প্রয়োজনীয় টীকা-ও সংযোজন করা গেল বর্তমান পাঠকদের উদ্দেশে।]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : নীরেনদার সামনে যখনই আসি, একটা খুব পুরোনো স্মৃতি আমার ফিরে ফিরে আসে— কখনো ভুলতে পারি না। ১৯৫৬ সালে কলেজের একেবারে প্রথম বর্ষের ছাত্র যখন আমরা, প্রেসিডেন্সি কলেজে এক কবিসম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল জানুয়ারি মাসে। তাতে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'উট পাখি' আবৃত্তি করেছিলেন, সুভাষদা (মুখোপাধ্যায়)

'লোকটা জানলই না' আবৃত্তি করেছিলেন, বুদ্ধদেববাবু (বসু), বিষ্ণুবাবু (দে) কী পড়েছিলেন এখন মনে পড়ে না, কিন্তু প্রচণ্ড উজ্জ্বল হয়ে এখনও মনে পড়ে নীরেনদা (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) পড়েছিলেন 'অমলকান্তি'— যে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল, অন্যেরা কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার— কিন্তু অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারে নি। এখনও সেই স্মৃতিটা খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আর কোথায় নীরেনদার পরের কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে যায় এটা, যে, বারবার এক-একটা অত্যন্ত সজীব চরিত্র বিচ্ছিন্ন নয়, একা নয়, হারিয়ে যাওয়া নয়, শহরের মাঝখান থেকে অতর্কিতে আচমকা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসে আমাদের সচকিত করে দেয়। আমার মাঝে-মাঝে কৌতূহল হয়েছে, নীরেনদাকে কখনো সরাসরি জিজ্ঞাসা করি নি, এই চরিত্রদের— বিশেষ করে ওইরকম অদ্ভুত একটা পরিবেশ, যেখানে অপ্রত্যাশিত তারা— সেখান থেকে কী করে ওদের খুঁজে পান— কী করে তারা নীরেনদার কবিতায় স্থান করে নেয়, আমার জানতে বার-বার কৌতূহল হয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শমীক, আসলে তাদের কাউকে খুঁজতে হয় না, তারা একেবারে সরাসরি আমার কবিতার মধ্যে চলে আসে। কিভাবে আসে বলি— আমার কাছে কবিতা তো কোনো কল্পনারাজ্যের ব্যাপার নয়, আমার চারপাশে আমি যা দেখছি, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, যা কিছু দেখছি— আসলে তাই নিয়েই তো আমার কবিতা। এই চরিত্রগুলিকেও আমি কিন্তু রাস্তা-ঘাটে দেখেছি, কাউকে আমার স্কুল-জীবনে পেয়েছি, কেউ খুব কাছে এসেছে, কাউকে দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু কাছে থেকেই দেখি আর দূর থেকেই দেখি— এরা একেবারে অনিবার্যভাবে আমার কবিতায় এসে ঢুকে পড়েছে। অনেক সময় একটা দৃশ্য দেখলুম, একটা মানুষ দেখলুম, একটা মানুষের মুখ দেখলুম— রাত্রে ফিরে গিয়েই সেই মানুষটিকে নিয়ে, সেই মুখশ্রীকে নিয়ে আমাকে লিখে ফেলতে হয়েছে আমার কবিতা। আবার এমনও হয়েছে যে, অনেক সময় একজনকে দেখেছি, তারপরে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এটা একেবারে ভীষণ সত্য কথা। আমি রাস্তায় একটা পাগলিকে দেখেছিলুম। এই পাগলি— তাকে নিয়ে সবাই খুব মজা পেয়ে গিয়েছিল। ঢিল ছুঁড়ছিল। ঢিল ছুঁড়ে মারছিল, কাগজের টুকরোগুলো পাকিয়ে মারছিল। আর এই পাগলি আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেল, আমি গোটা ব্যাপারটা দেখলুম, দেখে ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছিলুম। কিন্তু পঁচিশ বছরের মধ্যে তাকে নিয়ে কিছু লেখা হয় নি। আমি জানতুম তাকে নিয়ে একদিন লিখতে হবে। পঁচিশ বছর বাদে হঠাৎ একদিন একটা লোকের একটা কথা শুনে— যে, এই শহরে পাগলদেরও নিস্তার নেই, শুধু এই একটা কথা শুনলাম বাজারে গিয়ে, বাড়িতে ফিরলাম ও লিখতে বসে গেলাম। এই পাগলি পঁচিশটা বছর আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল এবং আমার ঘাড় ধরে তাকে নিয়ে কিন্তু লিখিয়ে নিয়েছে। ঠিক এইরকমই একটা কবিতা হচ্ছে 'বাতাসি'। বাতাসি কে, আমি জানি না। এটাও একটা মজার ব্যাপার। আমি আমার বন্ধু অরুণকুমার সরকারের বাড়ি থেকে একটা নাটকের রিহার্সাল দিয়ে ফিরছি। ফিরছি কলকাতার রাস্তা দিয়ে, সন্ধে পার হয়ে গিয়েছে, রাত্তির আটটা-নটা বাজে। আর তেত্রিশ নম্বর বাসে চড়ে আমি পাইকপাড়ার

দিকে যাচ্ছি দক্ষিণ কলকাতা থেকে। পার্ক সার্কাসের যে-ময়দান— ময়দানের পিছনের রাস্তা দিয়ে ওই বাসটা যেত। রাস্তার ধারে কিছু বস্তিবাড়ি। ওপর থেকে দেখলাম যে সেই... কাঁচা-কয়লার ধোঁয়ায় কলকাতার রাস্তা একটা আবছা মতন চেহারা নিত আগে, এখন তো কাঁচা কয়লার ধোঁয়া কমে গেছে অনেক... তার মধ্যে থেকে একটা লোক, ওই বস্তির ভিতরের গলি থেকে একটা লোক হঠাৎ 'বাতাসি-বাতাসি' বলতে বলতে চেঁচিয়ে এল। এসে, আমাদের বাসের সামনে খুব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গিয়েই আবার তার পাশের গলি দিয়ে পিছন ফিরে চলে গেল 'বাতাসি-বাতাসি' বলে। আর আমার ভেতর একটা ভাবনা শুরু হয়ে গেল— 'বাতাসি' ওর কে? ওইভাবে ছুটে বেরোল কেন? একেবারে চারপাশের সবকিছুর সম্পর্কে এমন অচেতনভাবে ছুটে বেরোল লোকটা— আর আমি ভাবছি, 'বাতাসি' কি ওর স্ত্রী, ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে? বাতাসি কি ওর প্রেমিকা যাকে পেলে ও তাকে খুন করবে? অথবা হয়তো ও তার পায়ের পাতার ওপরে মাথা রেখে মুখ ঘষে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সেই রাত্রিতেই কবিতাটা লেখা হয়ে গেল... আমি কবিতাটা পড়ব?

শমীক : পড়ুন।

নীরেন্দ্রনাথ :

'বাতাসি! বাতাসি!'— লোকটা ভয়ংকর চেঁচাতে চেঁচাতে
গুমটির পিছন দিকে ছুটে গেল
ধাবিত ট্রেনের থেকে এই দৃশ্য চকিতে দেখলুম।
কে বাতাসি? জোয়ান লোকটা অত ভয়ংকরভাবে
তাকে ডাকে কেন? কেন
হাওয়ার ভিতরে বাবরি-চুল উড়িয়ে
পাগলের মতো
'বাতাসি! বাতাসি!' বলে ছুটে যায়?

টুকরো-টুকরো কথাগুলি ইদানীং যেন বড়ো বেশি
গোঁয়ার মাছির মতো
জ্বালাচ্ছে। কে যেন কাকে বাসের ভিতরে
বলেছিল, 'ভাবতে হবে না,
এবারে দুদ্দাড় করে হেমাঙ্গ ভীষণভাবে উঠে যাবে, দেখে নিস।'
কে হেমাঙ্গ? কে জানে, এখন
সত্যিই দুদ্দাড় করে সে কোথাও উঠে যাচ্ছে কি-না।
কিংবা সেই ছেলেটা, যে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে পাশের
মেয়েটিকে অদ্ভুত কঠিন স্বরে বলেছিল,
'চুপ করো, না হলে আমি

সেইরকম শাস্তি দেব আবার—' কে জানে
'সেইরকম' মানে কী-রকম! আমি ভেবে যাচ্ছি,
ক্রমাগত ভেবে যাচ্ছি, তবু
গল্পের সবটা যেন নাগালে পাচ্ছি না।
গল্পের সবটা আমি নাগালে পাব না।
শুধু শুনে যাব। শুধু এখানে-ওখানে,
জনারণ্যে, বাসের ভিতরে, হাটে-মাঠে
অথবা ফুটপাথে, কিংবা ট্রেনের জানলায়
টুকরো-টুকরো কথা শুনব, শুধু শুনে যাব। আর
হঠাৎ কখনো কোনো ভূতুড়ে দুপুরে
কানে বাজবে: 'বাতাসি! বাতাসি!'

ব্যাপারটায় একটা মজার জিনিস আছে শমীক। সেটা হচ্ছে গিয়ে, আমি তো এই দৃশ্যটা দেখেছিলাম একটা বাসের দোতলা থেকে। দোতলা বাসে যাচ্ছিলাম তো। কিন্তু কবিতাটি লেখবার পরে দেখছি আমার অজান্তেই হয়েছে ঘটনাটা— 'ধাবিত ট্রেনের থেকে এই দৃশ্য চকিতে দেখলুম'। আমি অনেক দিন ভেবেছি যে এটা কেন হলো? আমি দেখলাম বাস থেকে আর লিখলাম ট্রেন থেকে দেখেছি! তার মানে কি এই, যে, বাসের চাইতে রেলগাড়ির রহস্য অনেক বেশি? রেলগাড়ি থেকে একটা দৃশ্য দেখলে সেই দৃশ্য এমন রহস্যময়তার স্পর্শ পেয়ে যায়— যা বাসের থেকে দেখা দৃশ্য থেকে আমাদের আরো বেশি টানে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কেন এইভাবে কোথায়... আমি ইচ্ছে করে লিখি নি— কিন্তু হয়ে গেছে।

শমীক : একটা জিনিস আপনার কবিতায় লক্ষ করি, প্রথম থেকে টানা পড়তে পড়তে, যে কোথাও শুরুতে, একেবারে প্রথম দিকের, ধরুন 'নীলনির্জন'-এর একেবারে প্রথম দিকের কবিতাগুলোতে, সেখানে কিন্তু অনেক বেশি একটা 'ভাব'-এর আলাদা রাজ্য আছে। মাটি যেন ছোঁয় না, সম্পূর্ণ কল্পনা— সেই একটা আলাদা আভাসের মধ্যে আলাদা একটা ভুবনের মধ্যে চলে কবিতা। তারপর কোথায় কবিতা আস্তে-আস্তে কলকাতার মাটি ছুঁতে থাকে, মাটি স্পর্শ করতে থাকে— মাটিতে শিকড় গাড়তে থাকে। এর মধ্যে কি কোথাও আপনার পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় আসা— কলকাতার সঙ্গে একটি সম্পর্ক তৈরি করা, তার একটা ইতিহাস কোথাও লুকিয়ে আছে? মানে... কবিতাটা পালটেছে?

নীরেন্দ্রনাথ : আমার ছেলেবেলা তো একেবারেই পূর্ববঙ্গে কেটেছে। বাবা কলকাতায় অধ্যাপনা করতেন— ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। মা কলকাতার সংসার সামলাতেন, মা'কে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। আমার দিদি কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু আমার ঠাকুরদা, ঠাকুমা আমাকে কলকাতায় আসতে দেন নি। আমার যখন দু'বছর বয়স, তখন মা আমাকে আমার বড়ো কাকিমার হাতে তুলে দিয়ে কলকাতার সংসার সামলাতে চলে এসেছিলেন। আর এই নিয়ে মায়ের খুব দুঃখ ছিল। বাড়িতে তখনও পর্যন্ত আমি একমাত্র ছেলে। আমাদের

গ্রামটা পূর্ববঙ্গের শুধু বললে কম বলা হয়, একেবারে নাবাল এলাকার একটি গ্রাম। ছোটো গ্রাম— মাত্র আঠারো ঘর বাসিন্দা। সেই গ্রামে একটা স্কুল নেই, একটা পাঠশালা পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেইখানেই আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে আমি রয়েছি। মা খুব কান্নাকাটি করতেন ঠাকুমাকে চিঠি লিখে যে, এবারে খোকাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক, ওকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে— এ-সব বলে। কিন্তু ঠাকুরদা শুনতে চাইতেন না। একদিন দুপুরে... (হেসে) আমি ঘুমোচ্ছি ভেবে ঠাকুরদা-ঠাকুমার কথা হচ্ছে। ঠাকুমা বললেন, এবার ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো, তার কারণ বউমা খুব কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে। ঠাকুরদা বললেন যে, কলকাতায় গিয়ে কী হবে? ঠাকুমা বলছেন, ও স্কুলে ভর্তি হতে পারবে। ঠাকুরদা মারাত্মক একটা কথা বলেছিলেন... ওঁদের ধারণা আমি ঘুমিয়ে আছি, যদিও আমি ঘুমোই নি। উনি বললেন যে, ওর বয়স এখনও ছ'বছরও তো হয় নি, ও এখনই সাঁতার শিখে গেছে। আমাদের পুকুরটা সাঁতরে পার হতে পারে, এপার-ওপার করতে পারে। ও গাছে উঠতে পারে। ওকে একটা টাকা দিয়ে হাটে পাঠালে ফিরে এসে ফিরতি পয়সার হিসাবটা বুঝিয়ে দিতে পারে। ও তোমাকে আমাকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনায়। কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে শোনায়। কলাপাতায় অ, আ, ক, খ লিখতে পারে। কলকাতার কোন্ স্কুল একটা ছ'বছরের ছেলেকে এর চেয়ে বেশি শেখায়?

শমীক : বাঃ! (হাসি)

নীরেন্দ্রনাথ : ঠাকুমা আর কোনো উত্তর দিতে পারলেন না, কিন্তু তারপরেই অবশ্য আমায় কলকাতায় সাত বছর বয়সে চলে আসতে হলো। কলকাতাকে আমি ভালোবাসতে পারি নি গোড়ার দিকে। তার কারণ আছে। আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামের কোনো বাড়ির কথা ভাবতে পারি না যে-বাড়ির দরজা আমার জন্য খোলা নেই। আর কলকাতা শহরে এসে দেখলাম প্রায় সব দরজাই বন্ধ। মাত্র একটা-দুটো দরজা খোলা পাচ্ছি। একটু বড়ো হলাম, লিখতে শিখছি, লিখছি, কবিতা লিখছি। কিন্তু কবিতা নিয়েও আমি কোথায় গিয়ে কাকে দেব? সব দরজা তো বন্ধ। কয়েকজন, তাদের দরজা খোলা ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের দরজা খোলা ছিল। আর বাকি দরজা বন্ধ। আমি কলকাতাকে কী করে ভালোবাসব? আমার মনে হতো, এ-দরজাগুলো একসময় আমাদেরকে ধাক্কা মেরে-মেরে ভেঙে ফেলতে হবে। ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকতে হবে। এখানে তো আমাদেরই ঢোকার কথা ছিল। ঢুকতে পারছি না কেন? ভীষণ রেগে যেতাম— আমি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার— আমরা ভীষণ এই-সব কথা বলতাম যে, কারা ওখানে থাকে, কারা ওখানে চা খাচ্ছে, গল্প করছে! ওখানে তো আমাদের থাকবার কথা। এরা সমস্ত ভুল লোকের সঙ্গে চা খাচ্ছে, এত বড়ো কবিরা। আমরা এইভাবে জ্বলে-পুড়ে মরেছি তখন। এই জায়গাটাকে কী করে ভালোবাসব? কিন্তু আস্তে-আস্তে... সময় নেয়... তারপর একসময় কলকাতার সঙ্গে একটা প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম। সেই কলকাতা এখনকার কলকাতা নয়। সে-সম্পর্কে অনেক পরে লিখেছি— সেই সময়কার কলকাতা কী রকম ছিল...

শমীক : নীরেনদা, একটা প্রশ্ন এসেছে।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, নমস্কার, বলছি আমার প্রশ্নটা ছিল, আপনার কবিতা লেখার পিছনে কে আপনাকে সব থেকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ?

শমীক : কোনো ব্যক্তি কি আপনাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কবিতা লেখার পিছনে ?

নীরেন্দ্রনাথ : না, ব্যাপারটা কী আমি বলি, আমার যখন চার বছর বয়স কাকে কবিতা বলে আমি জানতাম না। তো, চার বছর বয়স যখন, একদিন আমার বড়ো কাকিমাকে বলেছিলাম... খেলার মাঠ থেকে বাড়িতে ফিরে এসে বলেছিলাম যে, 'রাত হলো, ভাত দাও'। তাতে বড়ো কাকিমা বললেন, 'একি ! তুই তো কবির মতন কথা বলছিস দেখছি !' এটাই কি কবিতা ? এর মধ্যে তো কোনো মিল-টিল নেই ! তবে 'রাত হলো' আর 'ভাত দাও' হয়তো কোনো-একটা জায়গায় একটা ভারসাম্য রক্ষা করছে। এটা হতে পারে— আমি ঠিক জানি না। আমার কাকিমা খুব উৎসাহ দিতেন। তাছাড়া (হেসে)... বন্ধুবান্ধবরা অনেকে উৎসাহ দিয়েছে। আমার ছেলেবেলায় একটা বন্ধু ছিল— 'বাদল'। আমার সমবয়সি। তার কাছ থেকে লেখার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহ পেতুম। খুবই উৎসাহ পেতুম। তারপর কলকাতায় এলুম, স্কুল ম্যাগাজিনে একটা কবিতা ছাপাও হলো... তো এই রকম... এইরকমভাবে শুরুটা। আর তারপরে তো রোজ পাঁচটা-সাতটা করে কবিতা লিখে ফেলতুম। আর তারপরে প্রচুর কবিতা এখানে-ওখানে পাঠাতুম। এমন কোনো পত্রিকা বোধহয় নেই যেখানে কবিতা পাঠাই নি, আর এমন কোনো পত্রিকাও বোধহয় নেই, যেখান থেকে আমার কবিতা ফেরত আসে নি। সব লেখা ফেরত চলে আসত (হাসি)। এমনকি আমি ডাকটিকিট দিয়ে দিতাম; তা সত্ত্বেও অনেক লেখা ফেরত আসত না। ছাপাও হতো না। বোধহয় ডাকটিকিটগুলো সম্পাদকের অন্য কাজে লেগে যেত। সেই ডাক টিকিটগুলো নিয়ে কোনো সম্পাদক হয়তো প্রেমিকাকে চিঠি লিখেছেন— একটা ডাক টিকিটের অভাবে পাঠাতে পারছিলেন না; আমার ডাক টিকিটটা লাগিয়ে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলেন।

শমীক : উপকারই করলেন (হাসি)...

নীরেন্দ্রনাথ : (হাসি) উপকারই করলাম...

শমীক : আপনার কলকাতার মাটিতে আবার বসে যাওয়ার, মানে কলকাতার মাটিতে আবার মিলে যাওয়ার যে-অভিজ্ঞতার কথা বললেন, তার থেকে একটা সময় এল আমরা দেখলাম যে, কলকাতার যা-কিছু টালমাটাল ঘটনা, যা-কিছু সংকট আসে নীতির জায়গায়, বিশ্বাসের জায়গায়, রাজনীতির জায়গায়, প্রত্যেকটার সঙ্গে কিন্তু আপনি কোথাও সাড়া দেন এবং সেই কলকাতা, যে-কলকাতাটা মায়াবী-কলকাতা না, বা আড্ডায় জমানো কলকাতা, কিংবা বাবু-কলকাতার ভগ্নাবশেষ— সেই কলকাতা না; একেবারে এই মুহূর্তের কলকাতা, যে-কলকাতার ভিতর দিয়েই 'কলকাতার যিশু' হেঁটে যায়। এই কলকাতার সঙ্গে এই-যে আপনার একটা অন্য সম্পর্ক তৈরি হলো, যে-কলকাতাকে আপনি বারবার নিয়ে আসেন এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে এই কলকাতাকে দেখেন, তার সঙ্গে কি কোথাও আপনার কিছু-কিছু

বন্ধুবান্ধব, যেমন গৌরকিশোর ঘোষ— আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনিও কিন্তু ঠিক এইভাবে কলকাতা নিয়ে ভাবতেন— আরো হয়তো এরকম কিছু মানুষকে নিয়ে একটু অন্যভাবে কলকাতাকে দেখা, একটু সরে দেখা, এটা কি ঘটত?

নীরেন্দ্রনাথ : আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে, একটা সময় তো এই শহরটাকে ভালোবাসতে পারি নি, আমার খালি মনে হতো এই শহরটায় এনে আমাকে আটকে ফেলা হয়েছে। একটা সময় এইভাবে আমি আমার কলকাতার জীবনকে দেখেছিলাম। কিন্তু আর-একটা সময় আমি এই শহরটারই সঙ্গে একটা প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়েও গিয়েছি, আর এখন আমি কলকাতা ছেড়ে কোথাও থাকবার কথা— দু-চারদিনের জন্য যেতে পারি— কিন্তু অন্য কোনো বড়ো জায়গায় থেকেই যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমি দেখেছি বাইরে গেলেই তারপরে অনিবার্য একটা টান ভেতরে ভেতরে থেকে যায় কলকাতায় ফিরে আসা। এই কলকাতার ভালো-মন্দ দুটোর সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে গিয়েছি। এর মন্দটা আমার সহ্য হয় না, আমি খুব দ্রুত রিঅ্যাক্ট করি আর কি, খুব দ্রুত, কেমন? আর এর ভালোটায় আমি খুব গৌরব বোধ করি। কলকাতা ভালো হলে আমার সেটা যেন একটা ব্যক্তিগত সাফল্যের ব্যাপার মনে হয়। কলকাতা থেকে কেউ কোনো একটা বড়ো কিছু করেছেন— কোনো কলকাতার মানুষ— এইটে প্রায় আমার নিজের ব্যক্তিগত গৌরবের একটা ব্যাপার বলে মনে হয়। আর কলকাতা কোনো ব্যাপারে একটু পিছিয়ে পড়ল, কোনো ব্যাপারে একটু মার খেয়ে গেল, কোনো-একটা ব্যাপার কোনো-একটা অগৌরবের ঘটনা এখানে ঘটল, এটা আমার ব্যক্তিগত অগৌরবের ব্যাপার বলে মনে হয়— এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ এখন আর নেই। গৌর (গৌরকিশোর ঘোষ) আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একেবারে আমাদের যখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়স তখনকার বন্ধু। আমি গৌরকেও দেখেছি... গৌরও, কলকাতায় তার ছেলেবেলা কাটে নি, গৌরও বাইরে থেকে কলকাতায় এসেছে, আমরা সবাই বহিরাগত, কিন্তু একটা বহিরাগত মানুষ এই শহরটাকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল। আমিও বেসেছি, গৌরও বেসেছে, সন্তোষকুমার ঘোষও ভালোবাসতেন এই শহরটাকে, এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। তিনি বাইরের লোক, একটা মফস্‌সল-শহর থেকে কলকাতায় তিনি এসেছিলেন। কেমন? এইরকম সমস্ত। আমাদের অরুণকুমার সরকারের কথা হচ্ছিল, ওঁরা কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের লোক, ওঁরাও কিন্তু কলকাতার লোক নন। কিন্তু এই শহরটাকে ছাড়বার কথা এঁরা কেউই কখনো ভাবতে পারেন নি, আমিও পারি নি।

শমীক : আপনার কবিতা লেখার বাইরে অনেকটা সময় ধরে একটা কাজের জায়গা তৈরি হয়ে গেল— *আনন্দবাজার পত্রিকা*-কে ঘিরে, *আনন্দমেলা*, আনন্দবাজারের নানা বিভাগ, সেটা আপনার কবিতাকে কি কোথাও ব্যাহত করেছে? না অন্য-একটা সুখ, অন্য-একটা জায়গা আপনি তৈরি করে নিয়েছেন?

নীরেন্দ্রনাথ : আমি অনেকদিন আগে *Telegraph*-এ লিখেছিলাম 'The poet as a

journalist'* কেমন? আমি তাতে বলেছি, এটা খুব ভুল কথা... আমি দুটোকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারি। আমি যখন কাজ করি, আমার সংবাদপত্রে কোনো-একটা কাজ করছি, তখন আমি কাজই করছি। আমি তখন কবিতার মধ্যে নেই। আর যখন একটা কবিতার কথা ভাবছি, কি যখন ছোটোদের জন্য একটা পত্রিকা করে দেব ভাবছি, তখন অন্য কোনো কথা আমার মাথায় আসে না। ওর মধ্যেই ডুবে যাই।

শমীক : আবার একটা প্রশ্ন এসেছে ফোনে, শুনতে পাচ্ছেন?

নীরেন্দ্রনাথ : হ্যাঁ বলুন।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, আমি দুর্গাপুর থেকে চৈতালি মজুমদার বলছি। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা উত্তর-আধুনিক কবিতা যে লেখা হচ্ছে সেটায় কোন্ দিকে নজর রাখতে হবে? লিখতে হলে কোন্ কোন্ দিকে নজর রাখতে হয়?

নীরেন্দ্রনাথ : ঠিক শুনতে পেলাম না। প্রশ্নটা কী ছিল?

শমীক : উত্তর আধুনিক কবিতা যা লেখা হচ্ছে সেটা লিখতে গেলে কোন্ দিকে নজর রাখতে হবে— সেটাকে উত্তর-আধুনিক চারিত্র দিতে গেলে?

নীরেন্দ্রনাথ : প্রথম কথা, 'উত্তর-আধুনিক কবিতা' কাকে বলে সেটা আমি খুব ভালো জানি না যে! এটার উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে 'কবিতা' লিখতে গেলে কী করতে হয় সেটা বোধহয় আমি বলতে পারি। অনেক দিন ধরে লিখছি তো, এখন বোধহয় একটা বলার অধিকার জন্মে গেছে। কবিতা লিখতে হলে কবিতাই লিখতে হয়, তখন আর পাঁচরকম ব্যাপার নিয়ে ভাবতে নেই। যে-বিষয় নিয়ে লিখছেন তাতে মন দেওয়াই ভালো। আধুনিক, উত্তর-আধুনিক—এইগুলো আমি ঠিক বুঝি না। আর এগুলো খুব একটা বোঝার ব্যাপার বলেও আমার মনে হয় না। 'কবিতা' লেখাটা দরকার। তারপরে, সেইটা কোন্ জাতের কবিতা হলো, সেটা প্রাচীন কবিতা হলো, নাকি আধুনিক কবিতা হলো, নাকি উত্তর-আধুনিক কবিতা হলো— এটা ভাববার বিষয় নয় কিন্তু।

শমীক : আরো একটা প্রশ্ন এসেছে।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, আমি বৈদ্যবাটি থেকে গৌতম মুখার্জি বলছি। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে আমার কয়েকটা ছোটো প্রশ্ন আছে, আমি প্রথমে আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি এমন সুযোগ পাওয়ার জন্য, আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, আমি ক'টা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই... মানে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে, যে, কবিতাকে কালজয়ী হতে গেলে কবিতায় কী কী গুণ থাকা দরকার? আর দুই, ছন্দোবদ্ধ বা ছন্দ ছাড়া যে-কবিতা তার মধ্যে কোন্টা আপনাকে আকর্ষণ করে বেশি?

নীরেন্দ্রনাথ : আমাকে দুটোই আকর্ষণ করে। ছন্দ থাকলেও আকর্ষণ করে, আর যাকে আমরা ভাবি যে ছন্দ নেই, কিন্তু তার মধ্যেও ছন্দ থাকে— তা-ও আমাকে আকর্ষণ করে। আমি একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: রবীন্দ্রনাথ তো বাংলা কবিতার সব রকম ছন্দেই কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তারপরেও তাঁকে গদ্যে কবিতা লিখতে হয়েছিল। কিন্তু সে কী রকমের

গদ্য ? 'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী/মেঘলোকে উধাও পৃথিবী/নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী/অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী/অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা'। আসলে, এটা গদ্য কবিতা বলা হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যেও রয়েছে একটা ছন্দ। এমনকি এই কবিতাটাকে আমি 'স্ক্যান' করতে পারি। এই কবিতাকে, যদিও গদ্যে লেখা, স্ক্যান করা যায়। কিন্তু... আসলে ছন্দে কবিতা লেখা ভালো। তাতে ছন্দটাকে পেরিয়ে যাওয়াটা সহজ হয়। কিন্তু আগে ছন্দটা বুঝতে হবে। যিনি ব্যাকরণ জানেন না তিনি ব্যাকরণের সীমা পেরিয়ে যাবেন কী করে? পেরিয়ে যাওয়াটাই তো আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্যে কাকে পেরোচ্ছি এটা জানতে হলে তো আমাকে জিনিসটা জানতে হবে। ছন্দটা জানুন। আমি তো সব সময়ই বলি ছন্দটা জানতে হয়, তারপর ছন্দের কথা ভুলে গিয়ে কবিতা লিখতে হয়।

শমীক : নীরেনদা সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। শেষ একটা প্রশ্ন করব যেটা নিয়ে প্রায়ই আমি-আপনি আলোচনা করে থাকি— যে, আপনি পত্রিকার কাজ করতে গিয়ে— ভালো পত্রিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বাধা— আপনি অনেক কিছু করবার চেষ্টা করেছেন, প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, অনেকগুলো মান প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেকগুলো সম্ভাবনার জায়গা খুলে দিয়েছেন, আবার ধাক্কাও খেয়েছেন, বাধাও পেয়েছেন। আজকে, প্রায় সেই কাজের জায়গাগুলো শেষ হয়ে এসেছে, খুবই কম সেই কাজে আপনার যোগ... এখন কি মনে হয়, ওই ক্ষেত্রে আমরা কী করে আর-একটু এগোতে পারি, আর-একটু ভালো করতে পারি, আর-একটু ভালো করে বই করতে পারি— ছোটোদের জন্য, বড়োদের জন্য ?

নীরেন্দ্রনাথ : শমীক, তুমি খুব ভালোই জানো ব্যাপারটা। কারণ তুমি নিজে বইয়ের প্রোডাকশন-এর সঙ্গে খুব প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছো। এবং তুমি খুব অসাধারণ সুন্দরভাবে একটা বই প্রডিউস করতে পারো। তোমাকে বলার কোনো দরকার পড়ছে না, কিন্তু সকলকেই বলি, একটা জিনিস খুব সুন্দরভাবে বের করা— এটা একটা ধর্মের মতো ব্যাপার... আমার মনে হয় আমি কোনো-একটা ধর্ম থেকে চ্যুত হলাম। আমার একটা বই আছে তোমরা জানো— *কী লিখবেন কেন লিখবেন*। তার মধ্যে একটাও ছাপার ভুল নেই, তুমি জানো ? একটাও নেই।

শমীক : (হাসিমুখে সম্মতিসহ) হ্যাঁ দেখেছি।

নীরেন্দ্রনাথ : আমি এগুলোকে খুব একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার বলে মনে করি, যে, আমার বইয়ে একটাও ভুল থাকবে না। কেমন ? এম্‌নিতে ছোটোদের কাগজ করতে গিয়ে... তোমায় বলি, বড়োদের জন্য আর কী করতে পারি ! যা সমস্ত চারিদিকে চলছে— 'পূজা উপহার' লেখা হচ্ছে 'পূজাপোহার'। 'জো' নয় 'পো'। ছেড়ে দাও। রাস্তায় খুব বড়ো করে হোর্ডিং-টোর্ডিঙে এ-সমস্ত পড়ছে। এখন 'ধামাকা' চলছে, 'হাঙ্গামা' চলছে, কী অর্থে ? বিক্রি অর্থে। এগুলি আমি দেখি আর আমার খুব অবাক লাগে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে, ছোটোদের কথা ভাবতে হবে, বড়োরা এ-সব দেখুক, এই এক্সপোজার বড়োদের হচ্ছে— ভুল বানান, ভুল বাংলা— হতে দাও। কিন্তু ছোটোদের কোনো ভুল বানান, ভুল বাক্য...

কিংবা একটা ভুল তথ্যের সামনে একটা ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে...

শমীক : সেটা আমাদের একটা অপরাধ প্রায়...

নীরেন্দ্রনাথ : অপরাধ, পুরো অপরাধ! আমার ভাবতে খুব লজ্জা করে। এরকম কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে আমার খুব লজ্জা হয়, যেখানে নাকি ছোটোদের একটা ভুল শেখানো হচ্ছে। আমি ভাবতেই পারি না।

শমীক : আর-একটা ফোন এসেছে, এটা শুনে নিয়ে আমরা শেষ করব।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, নমস্কার, সন্দীপন রায় বলছি বালিগঞ্জ থেকে, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, আপনার 'কলকাতার যিশু' যে-কবিতাটা লিখেছিলেন তার প্রেক্ষাপট কী ছিল? আর, যে-সমস্ত পাঠক কবিতাকে অবোধ্য বলে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের আপনি কী পরামর্শ দেবেন যাতে তাঁরা কবিতা বুঝতে পারেন?

নীরেন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, যারা দূরের পাঠক তাদের তো আমি কাছে টানতেই চাই। আমি কিন্তু সবসময় মনে করি, আমার কবিতা যে লিখছি, আমি অন্যদের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করছি। লোকে অনেকভাবে পৌঁছোয়। কিন্তু আমার তো পৌঁছোবার অন্য কোনো রাস্তা নেই, আমি কবিতা লিখে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছোতে চাইছি। যাঁরা মনে করেন Poets talk to themselves to only overhear— আমি তাঁদের দলে নই। আমি লোকের কাছে পৌঁছোতে চাই।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, হ্যালো...

শমীক : (নীরেন্দ্রনাথকে) আর-একটা প্রশ্ন। (প্রশ্নকর্তাকে) হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করুন।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : আমি নীরেন্দ্রনাথবাবুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমি বাগুইহাটি থেকে নীলেশ দাশগুপ্ত বলছি। এখন আঠারো বছরের ছেলেরা কেউ আর কবিতা লেখে না, কেউ আর রোদ্দুর হতে চায় না— এ-বিষয়ে আপনি কী বলেন?

নীরেন্দ্রনাথ : আমি খুব দুঃখ জানাতে পারি (হাসি), এছাড়া আর কিছু পারি না।

[আলোচনার প্রথম পর্ব এইখানে শেষ। এর পরে থাকল আলোচনার দ্বিতীয় পর্বটুকু]

শমীক : আজ আবার আমরা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। গত শনিবার এই আলাপচারিতা শুরু হয়েছিল, শেষ হয় নি। আগের দিনের মতোই শ্রোতারা, দর্শকেরা চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন ফোনে...

নীরেনদা, আগের দিন 'কথায় কথায়' আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছিলাম, যেখানে আপনি বলেছিলেন যে, এক-একটা স্মৃতি, এক-একটা অভিজ্ঞতা, এক-একটা মানুষের হয়তো আর্তচিৎকার— সেগুলো আপনাকে তাড়িত করে কবিতা লিখতে, কবিতার কাছে নিয়ে আসে। এটাও যেমন সত্যি, তেম্‌নি আবার আর-একটা দিকও সত্যি যে, কবিতার ছন্দোবদ্ধ যে ভাষা শব্দ, তাকে আয়ত্ত করা, সেগুলোকে অস্ত্রের মতো শাণিত করার কথাও আপনিই বলেন। সেই কাজটা চলে কিন্তু, অর্থাৎ পুরো কাজটা শুধু অভিজ্ঞতা, আবেগ থেকে উৎসারিত

হয়েই কবিতা তৈরি হয় তা নয়, তার পিছনে একটা কারিগরির কাজও চলতে থাকে। এই দুটো কী করে পাশাপাশি চলে, বা একটার ওপর আর-একটা আছড়ে পড়ে, একটা আর-একটাকে কী করে ধাক্কা দেয়, মদত দেয়— সেটা যদি বলেন।

নীরেন্দ্রনাথ : ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, মানুষের যেটা... তার উপলব্ধি, যে, হাড়ে-মজ্জায় একটা ব্যাপার তার মনে হচ্ছে, হাড়ে-মজ্জায়, তখন স্বতঃই তার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে আসতে পারে। আমাদের বাংলা কবিতার দিকে যদি আমরা তাকাই, এরকম এক-একটা লাইন চোখে পড়ে, কানে আসে, আমরা একটু চমকেও যাই। ধরা যাক, একটা পুরোনো বাংলা গান, 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে'— সঙ্গে-সঙ্গে একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে, একটা নদীর ধারে একটা লোক বসে আছে, যার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে, বোধহয় আর নতুন কোনো কাজকর্মে হাত দেওয়ার আর কোনো স্পৃহা নেই, এই সময় প্রায় স্বতোৎসারিতভাবে একটা লোকের মুখ দিয়ে তার এই কথাটা, এই আর্তিটা বেরিয়ে আসতে পারে— 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে'। কিন্তু, আমরা যখন এই গানটি দেখছি, তখন এর পরের লাইনটা দেখে চমকে যাচ্ছি। এর পরের লাইনটা হচ্ছে... (তার আগে) এই-যে প্রথম লাইনটা, এটা একেবারে আর কিছুই না, একেবারে বুক নিংড়ে বেরিয়ে আসা একটি পঙ্‌ক্তি। কিন্তু এর পরের পঙ্‌ক্তি দেখে আমরা বুঝতে পারছি The Craftsman has taken over, কী রকম? তার পরের পঙ্‌ক্তিতেই আসছে 'তুমি পাড়ের কর্তা, দিয়ে বার্তা'... তুমি বুঝতে পারছ এখানে 'কারিগরি' এসে গেছে! একটি পঙ্‌ক্তি, তার মধ্যে 'পাড়ের কর্তা, দিয়ে বার্তা'— একটা অন্ত্যমিল কারিগর ঘটিয়ে দিচ্ছেন, এটা কিন্তু একেবারে 'নিজের থেকে' আসে নি, সচেতন একটা মানুষ এই কাজটা করেছেন। সেই সচেতন মানুষটিকে আমি কারিগর বলছি। কারিগর একজন থাকবেন ভেতরে। রবীন্দ্রনাথের ভেতরেও এমন অনেক পঙ্‌ক্তি আমরা পাই, বা পর-পর দুটি পঙ্‌ক্তি যখন পড়ি আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথম পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি— এই দু'জনের যে-রচয়িতা, এক মানুষ হয়েও ঠিক এক মানুষ নন। এটা আমার অনেক সময় মনে হয়। এটা আমি দু'জনের কথা বললুম, এটা আরো অনেকের ক্ষেত্রেই সত্য।

শমীক : আপনি বিশেষ একটা সময়ে ছন্দ নিয়ে, কবিতা লেখার কারিগরি, কৃৎকৌশল নিয়ে অনেক লেখা লিখেছেন এবং তা থেকে হয়তো অনেক নতুন কবি শিক্ষিতও হয়েছেন। আজকে যখন সেইটের দিকে ফিরে তাকান— ইদানীং খুব একটা লেখেন না ওরকম লেখা— কিন্তু একটা সময় প্রায় একেবারে মাস্টারমশাইয়ের মতো, কিন্তু খুব সহৃদয় ভালোবাসার মাস্টারমশাইয়ের মতো করে এগুলো নিয়ে লিখেছেন।

নীরেন্দ্রনাথ : আমি খুব খোলাখুলি বলছি তোমাকে, তুমি যেরকম বলছ, ছন্দের ওপর আমার একটা বই আছে, এম্‌নি, Basically Pattern of Bengali Poetry— এইটে নিয়ে একটা বই আছে আমার, 'কবিতার ক্লাস'। খুব মজা করে লেখা, তাছাড়াও একটা বই আছে 'কবিতার কী ও কেন'। এটা কাব্যতত্ত্ব নিয়ে লেখা। দুটোই একেবারে যারা নতুন এই জিনিসটার

মধ্যে তাদের জন্য লেখা; একটু মজা করে, একটু হালকা চালে লেখা। সত্যি কথা বলতে কী ,'কবিতার ক্লাস', মানে ছন্দের ব্যাপারটা লিখেছিলাম একেবারেই যারা প্রথম শিক্ষার্থী, এমনকি কলেজে পড়ছেন, ছন্দে পঁচিশটা নম্বর রয়েছে... কেমন? আমি দেখতাম আমার নিজের ছেলেই তখন ছন্দটা ভালো করে বুঝতে পারছে না, এবং ক্লাসে যা পড়া-টড়া শুনছে তাতে তার যেটুকু যা বুঝতে পারার, তা-ও আরো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে বোঝাবার জন্য ওটা একেবারে খেলার ছলে লিখলাম। লিখছি, আর তাকে সেটা পড়াচ্ছি— আমার ছেলে, (এখন) সে তো বাংলার অধ্যাপক— তো তখন আমার এক বন্ধু রমাপদ চৌধুরী বললেন যে, ওগুলো তুই আমাকে দিয়ে দে, আমি ওগুলো পর-পর পর-পর ছেপে যাচ্ছি। ফলে ওটা বেরোতে লাগল। আর, সত্যি ছন্দের ব্যাপারে আচার্য পুরুষ যিনি, সেই প্রবোধ সেন মশাই একটা চিঠি লিখলেন ছদ্মনামে এবং খুব উৎসাহ দিলেন। তার ফলে আমার তো আরোই... যেটুকু-বা আমার ভেতর একটু বাধো-বাধো ভাব ছিল সেটা কেটে গেল। এই হলো আর কি।

শমীক : আচ্ছা আপনি কি নিজে আলাদা করে, মানে আপনি যেভাবে বলেন কবিতার ভাষাকে আয়ত্ত করতে হয়, নিজের অধিকারে আনতে হয়, তবে সেটা অস্ত্র হয়ে ওঠে— এ-কথা আপনিই বারবার বলেছেন... সেই অস্ত্র তৈরি করার জন্য আলাদাভাবে কিছু আপনি কি চর্চা করেছেন? যেখানে জাস্ট পরীক্ষার জন্য, বা ভাষাকে আয়ত্ত করবার জন্যই আপনি কবিতা লিখছেন?

নীরেন্দ্রনাথ : শমীক তোমাকে বলি, একটা লেখা শুধু কবিতা কেন, একটা গদ্য লেখাও পড়তে-পড়তে অনেক সময় মনে হয়, যাঁরা মাস্টার-রাইটার্স, কেমন, তাদের লেখা পড়তে-পড়তে মনে হয় যে, এই শব্দটাকে যদি এখান থেকে তুলে ফেলি, সর্বনাশ হয়ে যাবে। দুটো শব্দ যেন একেবারে পরস্পরের সঙ্গে খুব সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। এম্‌নিতে আমার মনে একটা ভাবনা এল, সেই ভাবনাটাকে আমি একটা লাইনে লিখে ফেললাম, শব্দগুলো পর-পর বসিয়ে গেলাম, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, যে-কোনো পাঠক, একটু সতর্ক-পাঠক হলেই বুঝতে পারবেন এখানে এই-যে একটা বিন্যাস কতগুলো শব্দের হলো, এর কিছু-কিছু 'ধ্রুব-বিন্যাস'। এর একটা শব্দকে এখান থেকে তোলার উপায় নেই, কিংবা সেটাকে তুলে অন্য শব্দ যদি বসাই, তাহলে দ্বিতীয় শব্দটি সেখানে খুব অধোমুখ হয়ে বসে থাকবে। সে (শব্দটা) বুঝতে পারবে যে আমার জায়গা এখানে নয়, এখানে আমার বসবার কথা ছিল না। এটা তো খুব সহজ কথা। (কবি) প্রত্যেকদিনই লিখে যাচ্ছেন, লেখাই তো তাঁর অস্ত্র, আমাদের হাতে তো দ্বিতীয় কোনো অস্ত্র নেই...

শমীক : নীরেনদা একটা ফোন এসেছে, শুনে নিই...

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, আমি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। নমস্কার, আপনার কবিতা পড়তে-পড়তে একটা জিনিস ভীষণভাবে উপলব্ধি হয়েছে যে, আপনার লেখায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা, এবং সামাজিক শুভ-অশুভ সম্বন্ধে একটা

বিশেষ উপলব্ধি কাজ করে। আপনার একটা কবিতায় আপনি বলেছিলেন— 'তার আগে খুকু ভালো করে চিনে নাও কোন্‌টা বিষলতা, কোন্‌টা বিশল্যকরণী'— একটা শুভ-অশুভর ব্যাপার এবং সেইসঙ্গে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপার, যেটা ষাটের দশকের মধ্যে ভীষণভাবে ফুটে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-দের একটা শিবির বিভাগের ব্যাপার ছিল, সেইসঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি একটা লাইন তৈরি হচ্ছিল কিছু কবির। তো সেইসঙ্গে আপনারও, এর মধ্যে, সামাজিক দায়বদ্ধতার ছাপটা আমরা পাচ্ছিলাম। আবার ধরুন ঠিক সেই সময়েই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটা কবিতায় আপনার প্রসঙ্গে একটা ইঙ্গিত তুললেন, একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কির মতো করেই, কিন্তু তখন তার মধ্যেও একটা 'অনেস্টি' ছিল। একটা সততার জায়গা ছিল। তো কবিতা লিখছি, মানুষকে নিয়ে ভাবছি, সমাজকে নিয়ে ভাবছি, দায়বদ্ধতা নিয়ে ভাবছি— আজকে আপনার কী মনে হয়? আজকে যাঁরা কবিতা লেখেন ধরুন... বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় লিখছেন, বড়ো গোষ্ঠীতেও লিখছেন, তাদের মধ্যে কি এই 'গভীরভাবে ভাবা' ব্যাপারটা কাজ করে যে... আমার নিজস্ব কবিতার জায়গাও, আমার প্রায় সতীর্থ কবিদের জায়গায়ও— সেই জায়গাটা (আজ) কতটা এই সামাজিক দায়বদ্ধতার, সমাজকে ভালোবাসার?

নীরেন্দ্রনাথ : আপনার কথাটা, আমি আপনার কথাটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। একটা কথা বলি, আমি একটা সময়ে জন্মেছি আর, একটা সমাজের মধ্যে জন্মেছি আর, আমি তো মরা কাঠ নই, আমি তো একটা জ্যান্ত গাছ— এই সময় এবং এই সমাজ প্রতিনিয়ত আমাকে প্রভাবিত করছে। এর সম্পর্কে নানারকমের কথা আমার ভেতরে জমে যাচ্ছে। আমি সেই কথাগুলো বলতে চাই তো। আর আমি কোন্ ভাষায় বলব? আমার কাছে তো... কবিতাকেই আমি আমার মাতৃভাষা বলে মনে করি। লোকে বলে এর ভাষা ইংরেজি, এর ভাষা বাংলা, এর ভাষা হিন্দি, এর ভাষা উর্দু, আমি তেমনই মনে করি যে, গদ্য আর পদ্য— এই দুটোও ভাষা। কারো-কারো কাছে পদ্যটাই মাতৃভাষা, কারো-কারো কাছে নয়। তো আমাকে যদি কিছু বলতে হয় আমার ভাষায়, আমাকে কবিতার মধ্যেই বলতে হবে। ফলে, এই কথাগুলো আমার কবিতার মধ্যেই আমি বলে ফেলি। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। আর আপনি বীরেনের (বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) কথা তুলেছেন। বীরেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঠাট্টা করে একটা কথা আমার সম্পর্কে এক সময়ে লিখেছিল, আর শুধু লেখা নয় তাই নিয়ে আমি যখন বীরেনকে বললুম তখন বীরেন বলল, তুইও একটা লেখ না। আমি বললুম, না ভাই, আমি লিখব না, তাহলে লোকে বলবে একটা বুড়ো পাগল হয়েছে, এবার আর-একটা বুড়োও পাগল হলো। এটা ঠিক হবে না। আমি বিনা পয়সায় লোককে মজা পেতে দেব কেন? বীরেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও তো লিখতেই পারে।

শমীক : আরো-একটা প্রশ্ন এসেছে নীরেনদা...

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) **:** হ্যালো, আমি রূপশ্রী দত্ত বলছি, তালতলা থেকে। শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আমি আমার নমস্কার জানাই, শমীকবাবুকেও নমস্কার জানাই।

আমি জিজ্ঞেস করছি 'কলকাতার যিশু' বলে ওনার যে বিখ্যাত কবিতা, তো ওরকম একটি মায়াবী আলোয় চৌরঙ্গিতে ওরকম একটি রমণীয় অভিজ্ঞতা ওনার কি সত্যিই হয়েছিল? একটি শিশুকে কি উনি সত্যিই দেখেছিলেন?

নীরেন্দ্রনাথ : হ্যাঁ... খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমি একটা দোতলা বাসে করে ফিরছিলাম, সেই সময়ে দেখি, এখন যেখানে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে, ওর উলটো দিকে এখন যোগাযোগ দপ্তরের একটা মস্ত বড়ো বাড়ি হয়েছে, ওখানে কতগুলো গুদাম ঘরের মতো ছিল। একটি ছেলে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের দিক থেকে রাস্তাটা পার হচ্ছিল— একটা বাচ্চা ছেলে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড... আমরা সব তো ভীষণ শিউরে উঠেছিলাম, আর সমস্ত বাস ট্যাক্সি একেবারে, ওই যাকে বলে Came to a screeching hault, সমস্ত একেবারে, ড্রাইভার-টাইভার, আমি দেখলাম আমার চারপাশের লোক যারা, আমার যারা সহযাত্রী ছিলেন সকলে শিউরে উঠেছেন। ছেলেটা গটগট করে রাস্তাটা পার হয়ে গেল। সদ্য হাঁটতে শিখেছে, টালমাটাল পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেল, সক্কলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই মুহূর্তে ওই শিশুটির সঙ্গে... কলকাতার উলঙ্গ একটি ভিখারি মায়ের শিশু— ভিখারি তাতে কোনো সন্দেহ নেই— তার সঙ্গে বেথেলহেমের শিশুর কোনো পার্থক্য ছিল না আমার চোখে, সেই মুহূর্তে। আর যখনই সেটা মনে হলো... এটা ঘটনা, বৃষ্টির সময়, সেই মুহূর্তে আকাশটা পরিষ্কার, সন্ধের দিকে একটা মায়াবী আলো মাঝে-মধ্যে কলকাতার আকাশে ছড়িয়ে পড়ে... আপনার প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি যে, এই আলোটা আপনার চোখে না পড়বার কথা নয়। সত্যি একটা মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। সেই পরিবেশের মধ্যে যখন আমি ছেলেটিকে দেখছিলাম, একটা বাসের দোতলা থেকে, আমার কাছে তখন ওই শিশুটির সঙ্গে সেই ঈশ্বরপ্রেরিত শিশুটির কোনো তফাত ছিল না। এটাই ঘটনা।

শমীক : আরো-একটা প্রশ্ন এসেছে।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, আমি কবিকে প্রশ্ন করতে চাই যে, মানুষের বোধকে প্রাণিত করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে কবিতা ও গান, তা আজকে হতাশা-দারিদ্র্য-দ্বন্দ্বপীড়িত সমাজে মানুষের উন্নয়নের বোধকে সেভাবে প্রাণিত করতে পারছে কি কবিতা?

নীরেন্দ্রনাথ : সেটা তো কবির বলবার কথা না। যিনি কবিতা পড়েন তাঁর বলবার কথা। কিন্তু আমার মনে হয় চেষ্টাটা তো ছেড়ে দেওয়া উচিত না। আমরা তো চেষ্টা করছি, এই চেষ্টাটা হয়তো সফল হচ্ছে; (অথবা) হয়তো ততটাই সফল হচ্ছে না যতটা হলে ভালো হতো, কিন্তু তাই বলে চেষ্টাটা ছেড়ে দেব কেন? এইটুকুই বলতে পারি।

শমীক : যে-প্রশ্নগুলো এল তার থেকেও একটা প্রশ্নের রেশ চলে আসে যে, আপনি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন বা লিখতে থাকেন, তখন আপনার আগে, পরে, আপনার সমসময়ে আরো কবিরা কবিতা লিখছেন, তখন আপনার নিজের একটা স্থান কোথাও— কোথায় আপনি দাঁড়িয়ে, কার কাছ থেকে নিচ্ছেন, কাকে দিচ্ছেন, কাকে হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বীও ভাবছেন, কাউকে বন্ধু ভাবছেন— এরকম প্রায় একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিতা

লিখতে গেলে একটা হিসেব-নিকেশও করতে হয়। এটা কখনো করে দেখেছেন?

নীরেন্দ্রনাথ : না, কখনো করি নি। একটা কথা বলি, আমার ওপরে সঙ্কলেরই প্রভাব আছে... যাঁরা আমার আগে কবিতা লিখে গেছেন তাঁদেরও আছে, আর যাঁরা আমার পরে কবিতা লিখছেন এঁদেরও যে নেই এ-কথাটা আমি খুব জোর গলায় বলব না। আমি আবার সেই কথাটায় ফিরে যাচ্ছি— আমি তো মরা কাঠ নই, আমি তো জ্যান্ত গাছ। এমনকি, ছেলেবেলায় ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে পড়ে শোনাতাম কাশীরামের মহাভারত, আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ— তাঁদেরও প্রভাব আছে। নেই তা বলব না। আর রবীন্দ্রনাথের আছে, জীবনানন্দ দাশের আছে, এঁরা তো আমার আগের মানুষ, কেমন? যাঁরা আমার পরে এসেছেন— আমি সত্যি কথাটা বলি শমীক, এই কথাটা শুনে হেসো না— আমার নাতি-নাতনি, এদের কথাবার্তাও আমাকে প্রভাবিত করে। এই বাচ্চাদের সঙ্গে যখন কথা বলি, আমার নাতির বয়সি বাচ্চাদের সঙ্গে যখন কথা বলছি, তাদের কথাবার্তাও কিন্তু... মাঝে-মাঝে আমি দেখেছি এক-একটা কবিতার এক-একটা লাইনের হয়তো জন্মরহস্যটা তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, এরকম অনেক সময় হয়। আরে গান শেখে, গান গাইছে... কণিকার গান শুনছি... আর সুচিত্রা আমার খুব বন্ধু, অনেক দিনের বন্ধু, ওঁর গান শুনছি— এই গান থেকেও যে প্রেরণা পাই না সেই কথাটা বলব না। সবকিছুর থেকেই প্রেরণা পাই।

শমীক : আরো প্রশ্ন আছে নীরেনদা, ফোনে, শোনা যাক।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : আমি ভবানীপুর থেকে পথদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি। আচ্ছা, কবিকে আমি জিজ্ঞেস করব, আজকাল জনপ্রিয়তার লড়াইয়ের যে-যুগ এসেছে সে-যুগে মুখরোচক কবিতা মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে কবিরা লিখছেন— এ-বিষয়ে আপনার মতামত কী?

নীরেন্দ্রনাথ : কবিতা 'জনপ্রিয়' হয় এটা তো ঠিকই, কিন্তু জনপ্রিয় হবে মনে করে কবিতা লেখা— সত্যি কেউ লেখেন নাকি! আমি ঠিক জানি না। এ-ব্যাপারে, যদি কেউ লেখেন তো ঠিক কাজ করেন না, এটুকু বলতে পারি। তবে সত্যি কেউ জনপ্রিয় হওয়ার জন্যই লিখছেন, ওটা মাথায় রেখে, এ তো খুব সর্বনেশে কথা (হাসি)। এ তো ভালো কথা নয়, এরকম কেউ লিখছেন বলে কিন্তু আমার ঠিক মনে হয় না।

শমীক : আবার প্রশ্ন।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে) : হ্যালো, কবিকে আমার নমস্কার। কবির মুখ থেকে আমি একটু 'কলকাতার যিশু' কবিতাটা শুনতে চাই। যদি শোনান, খুব ভালো লাগবে আমার।

নীরেন্দ্রনাথ : (শমীককে) উনি 'কলকাতার যিশু' শুনতে চান? ওরে বাবা এ তো খুঁজে বের করতে দম বেরিয়ে যাবে। দেখি...

শমীক : আচ্ছা আর-একটা প্রশ্ন এসেছে, আপনি সেইটের জবাব দিন নীরেনদা, ইতিমধ্যে আমি কবিতাটা খুঁজে বের করে দিচ্ছি।

[যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে হয়তো, ফলত ফোন ধরা যায় না। তাই শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও বলেন] না। আমি আর-একটা প্রশ্ন করি। আপনার লেখাতে, আপনার গদ্য লেখাতেও

বারবার আপনার পুরোনো পূর্ববাংলার কথা চলে আসে। তার মধ্যেও, পূর্ববাংলার চেয়েও যেটা আমাকে অনেক সময় খুব নাড়া দেয় যে, আপনি নিজের ছোটোবেলা, নিজেকে প্রায় নিজের থেকে আলাদা করে একটি মূর্তি— ছোটো ছেলে, তার বড়ো হওয়া, তার ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদি ছোটো-ছোটো ঘটনাগুলো, আর কোথাও আপনি তার থেকে আলাদা, তাকে এনে দাঁড় করান। এটা কি আপনার কবিতা তৈরির বা আপনার সৃষ্টির মধ্যেও কোথাও কাজ করে? এই নিজেকে দেখা, কিন্তু নিজের থেকে আলাদা করে দেখা— এটাতে কিন্তু অনেক কবির মধ্যে খুব বড়ো একটা সৃষ্টির জায়গা তৈরি হয়ে যায়। আপনার ক্ষেত্রে?

নীরেন্দ্রনাথ : আমার একটা বড়ো কবিতা আছে। 'ও খোকা, তুই ঘুড়ি ওড়া', কেমন? সেটা আমার ছোটোবেলার যে-'শিশুটি', সেই শিশুটিকে প্রায় একদম সামনে দাঁড় করিয়ে লেখা। এর ফলে কবিতাটি খুব দাঁড়াল কি-না সেটা আমি জানি না... সেটা আমাকে খুব haunt করে, মানে পিছনের যে-জীবন, একেবারে ছেলেবেলার জীবন, একেবারে গ্রামের জীবন, যে-গ্রামে হ্যারিকেনবাতি খুব কম বাড়িতেই জ্বলত, সেই গ্রামের ভিতর থেকে আমি উঠে এসেছি শমীক, এই হচ্ছে ঘটনা। সেটাকে ভুললে আমার কবিতা লেখাই বন্ধ হয়ে যাবে। সেই পর্যায়টাকে যদি ভুলে যাই... সত্যি কথা বলতে কী, ওটা বিরাট একটা কাজ করে চলে আমার জীবনে— পিছনের স্মৃতিটা। ভীষণভাবে কাজ করে। আমার ছেলেবেলা আসলে কাটল না, অনেকে ঠাট্টা করে বলে যে, নীরেনদা আপনি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেলেন।

শমীক : আচ্ছা, এই-যে 'কলকাতার যিশু', একজন শুনতে চেয়েছিলেন...

নীরেন্দ্রনাথ :

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাকসি ও প্রাইভেট, টেমপো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু'দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানি ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।
খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গিপাড়ায়

এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারি-মায়ের শিশু,
কলকাতার যিশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই;
দু'দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টালমাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

শমীক : বাঃ! নীরেনদা, এটা বোধহয় শেষ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। আপনি যেমন বললেন যে, আপনার ছেলেবেলা কাটে না, পূর্ববাংলা কাটে না, আবার কিন্তু কলকাতা শহরের নানারকম অন্তর্বিরোধ, সংঘাত, অদ্ভুত পাগলামি, উচ্চণ্ডেপনা— এগুলোর প্রতি কিন্তু আকৃষ্ট হন এবং সেখানে প্রায়ই একটা নাগরিক-ব্যঙ্গ, খোঁটা, রাগ, যে-রাগটা কখনো ফুঁসে ওঠে না, ওই চাপা ব্যঙ্গের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে, যেমন ধরুন 'হ্যালো দমদম' কবিতায়, বা আরো অনেক কবিতাতে আসে। তার ফলে ওটা বোধহয় পুরোপুরি সত্য নয় যে, আপনি 'শিশু' থেকে গেছেন, আপনি আবার খুব 'শহুরে বুড়ো'ও হয়ে গেছেন।

নীরেন্দ্রনাথ : তবে আমি রাগ করি, কিন্তু কখনো একেবারে হতাশ হই না। আমি, যদি সময় থাকে, একটা ছোট্ট কবিতা তোমাকে শোনাব? তুমি শুনলে বুঝতে পারবে যে, নীরেনদা আসলে কিন্তু খুব নৈরাশ্যের ফাঁদে এখনও পড়ে নি। [হাসিমুখে শমীকবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে নীরেন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সিত কবিতাটা আবৃত্তি করেন:] 'একদিন সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হওয়ার মন্ত্র শিখে যাবে/একদিন সমস্ত বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে— যাই/একদিন সমস্ত ঘাম আর রক্ত অর্থ পাবে ভিন্ন রকমের। একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনার প্রতিমা বানাবে/একদিন সমস্ত নারী চোখের ইঙ্গিতে বলবে— এসো/একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের

উর্দি কেড়ে নিয়ে নিষ্পাপ বালক বলবে— হা-হা/একদিন এই-সব হবে বলেই এখনও সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে এবং কবিতা লেখা হয়।'

শমীক : বাঃ!

নীরেন্দ্রনাথ : আমি কী খুব নৈরাশ্যে ভুগি নাকি?

শমীক : এক্কেবারে না (হাসি)। আরো একটা প্রশ্ন এসেছে ফোনে।

প্রশ্নকর্তা (ফোনে): হ্যালো, প্রথমেই আমি আমার প্রিয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মশাইকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, এবং উপস্থিত শমীকবাবুকেও আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমি কবির কাছে প্রশ্ন রাখব যে, ওনার 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির উৎস কী? উনি কী দেখে বা কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা লিখেছিলেন? আমি প্রশ্ন করলাম পঙ্কজ রায়...

[স্পষ্টতই যান্ত্রিক গোলযোগে প্রশ্নকর্তার কথা কেটে-কেটে যায়। আমরা, শ্রোতারা তবু খানিক শুনতে পেলেও, স্টুডিও-র ফোনে হয়তো শমীকবাবু বা নীরেনবাবু কেউই অনুধাবন করতে পারেন না কী প্রশ্ন পঙ্কজ রায় করলেন। নীরেনবাবু বলেন, 'উলঙ্গ রাজা নিয়ে হয়তো কিছু...', শমীকবাবু উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, কবিতাটি পড়তে বলছেন।' নীরেন্দ্রনাথ জানতে চান, 'আর সময় আছে কি?' শমীকবাবু আশ্বস্ত করেন যে, 'হ্যাঁ আর-একটা কবিতা পড়বার মতো সময় আছেই', এবং নীরেন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে কবিতাটি খুঁজে বের করে কবির হাতে দেন।]

সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে: শাবাশ, শাবাশ!
কারো মনে সংস্কার, কারো ভয়;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যি অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে, কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক:
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

এটা আসলে একটা প্রতিবাদের কবিতা। এটা কোনো বিশেষ কিছু, বা কোনো সরকারের কিছুর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে এটা ভাববার কোনো দরকার নেই। এটা যখনই কোনো শাসকের বিরুদ্ধে কারো প্রতিবাদ করবার দরকার হবে, এই কবিতাটা তার হয়তো পছন্দ হলেও হতে পারে।

শমীক : এই-যে প্রতিবাদী একটা বোধ বা চেতনা এটা অনেক কবি আপনার সমকালে উচ্চারণ করেছেন— এরকম একটা কণ্ঠস্বর বা এরকম একটা ভাব। আপনি কিন্তু তার থেকে আলাদাভাবে প্রতিবাদের জায়গাটাতে আসেন, ছবি তোলেন, পুরোনো এক-একটা উপাখ্যান হয়তো টেনে আনেন, অর্থাৎ কখনো সরাসরি হাত-পা ছুঁড়ে, মুখ খিঁচিয়ে প্রতিবাদটা করবার দরকার হয় না, তাই সেখানেই বুঝি প্রতিবাদটা 'কবিতা' হয়ে ওঠে, এবং কবিতা 'প্রতিবাদ' হয়।

নীরেন্দ্রনাথ : শমীক, তুমি খুব ভালোই জানো, 'উলঙ্গ রাজা'র গল্পটা আসলে পৃথিবীময় রয়েছে, এবং বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষাতেও একেবারেই এইরকমের

একটি গল্প আমি ঠাকুমার কাছে শুনেছি— সে একটা চালাক দর্জি রাজাকে একটা কাপড় বুনে দিয়েছিল— সেই গল্পটা। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কেন বলব? আমার রাগ হয়েছে, রাগের মর্যাদাও তো থাকে, রাগের মর্যাদা নষ্ট হতে পারে এমনভাবে কথা বলব কেন? আমার ক্রোধটার মধ্যেও যেন একটা মর্যাদার ব্যঞ্জনা থাকে, এটা আমি চাই।

শমীক : বাঃ! এটা যে-কোনো আধুনিক কবির পক্ষে খুব চমৎকার একটা শেষ-কথা, এমন একটা আলোচনার পরে।

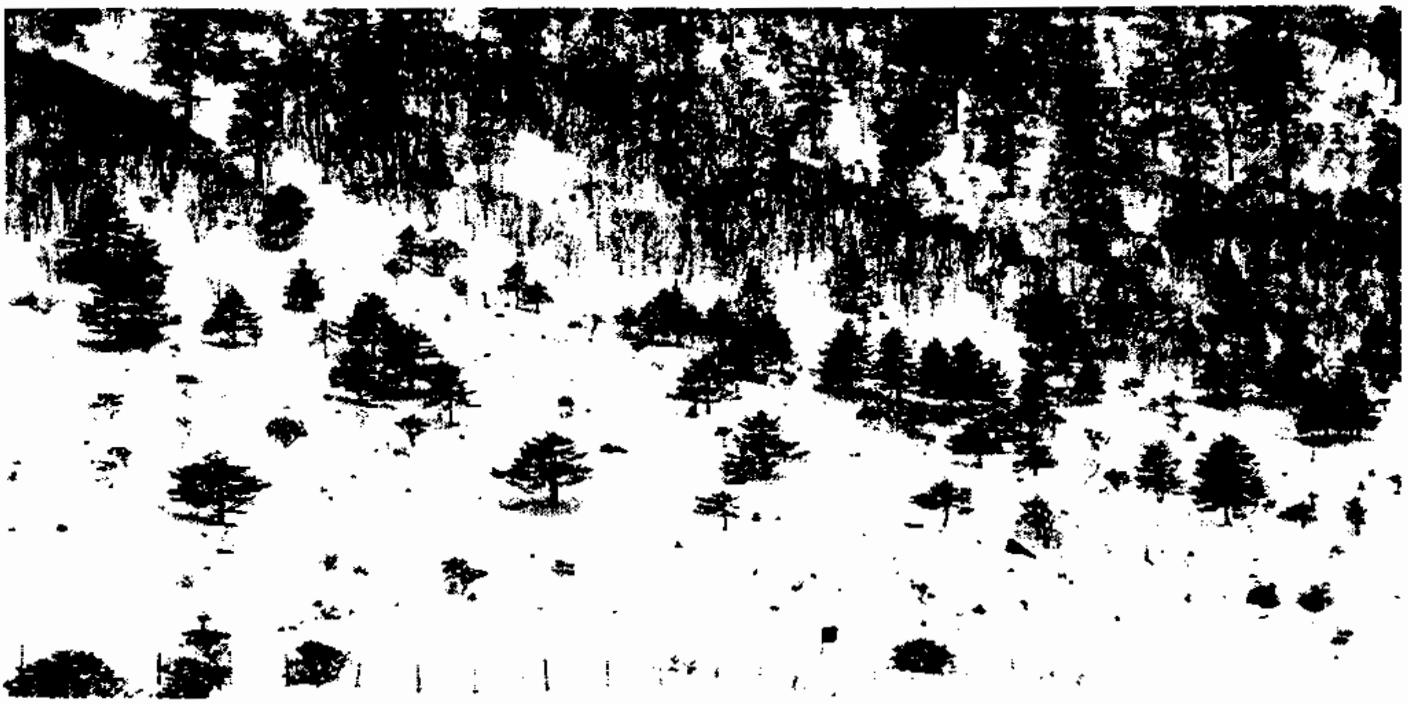

---

* [১৯৮৩ সালের ২ এপ্রিল *The Telegraph* পত্রিকায় 'The poet as a journalist' শিরোনামে প্রকাশিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর-র এই নিবন্ধটির শুরুতে লেখা ছিল— "Nirendranath Chakravarti on why he is happy being both"। আলোচ্য সাক্ষাৎকারের প্রসারিত পাঠ-নির্মাণ-স্বার্থে উক্ত নিবন্ধটির মলয় ভট্টাচার্য -কৃত বঙ্গানুবাদ টীকারূপে এইখানে সংযোজিত হলো।]

গত প্রায় চার দশক ধরে যে-সৃষ্টিকর্ম গভীর অধ্যাবসায়সহ আমি করে চলেছি, অর্থাৎ কবিতা রচনা, সেগুলোতে নিম্নমানের বলে দেগে দিয়ে যখনই কেউ প্রশ্ন করেন যে, আমার সাংবাদিকতার পেশাই এই নিচু মানের জন্য দায়ী কি-না, আমি কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। কী করে এই ওপরচালাকি-ভরা প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি আত্মমর্যাদাবোধ অটুট রেখে? এই প্রশ্নকে আমি ওপরচালাকি-ভরা বা ধূর্ত বলছি কারণ, প্রশ্ন করার আগে এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, আমার কবিতা অবশ্যই নিম্নমানের। কিন্তু, অন্যদিকে আবার এই প্রশ্নটাই আমাকে চমৎকার একটা ফাঁক দেখিয়ে দেয় গলে যাওয়ার মতো। কারণ, সেক্ষেত্রে

আমার সাংবাদিকতার পেশাটার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে অনায়াসেই আমি তো বলে দিতে পারি— যদি সাংবাদিকতার কাজটা না করতে হতো, আমার কবিতার মান অনেক-অনেক ভালো হয়ে যেত তাহলেই, এবং তখন বিরুদ্ধতম সমালোচকও বাধ্য হতেন আমার গুণ গাইতে।

এই প্রশ্ন আসলে একটা টোপ, এবং তার প্রতি আমাকে তাতিয়ে দেওয়া, কিন্তু আমি মোটেই রাজি নই সে-টোপ গিলতে। সম্পূর্ণ পৃথক একটা সৃজনক্ষেত্রে নিজের ব্যর্থতার দায় নিজের পেশার উপর চাপিয়ে দেওয়া মোটেই শোভন না কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে। এটা একেবারেই ন্যায্য না। বরং ব্যর্থতার দায় তার নিজের ওপরেই নেওয়া উচিত। যেমনটাই আমি সব সময় পালন করে এসেছি। আমার সমালোচকদের আমি বলেছি, কবি হিসেবে যদি আমি ব্যর্থ হয়ে থাকি তবে সে-দোষ একান্তই আমার।

বস্তুত, সাংবাদিকের পেশা যদি কখনো আমার কাব্যসৃষ্টির পথে বাধা মনে হতো, সেক্ষেত্রে সাংবাদিকতাকে দোষ না দিয়ে আমি তো বরং আমার পেশাটাই বদলে নিতে পারতাম। পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যাওয়া যদিও অবশ্যই একজনের পক্ষে বেশ সমস্যাসংকুল, বিশেষত ভারতের মতো বেকারত্বজর্জর একটা দেশে। কিন্তু, আমি অন্তত চেষ্টাটা তো করতে পারতাম। আসল প্রশ্ন তাহলে: আমি কি কখনো আমার পেশা বদলাবার চেষ্টা করেছি? না, কখনোই করি নি। বরং এই পেশাতেই থেকে যাব বলে আমি অন্য নানা পেশার সম্ভাবনাই পরিত্যাগ করেছি। হ্যাঁ, আদতে এমনটাই করেছি আমি। আমার মা-বাবা চেয়েছিলেন ছেলে সলিসিটর হোক, এবং ভালোরকম টাকাও ঢেলেছিলেন যাতে একটা সলিসিটর্স ফার্ম-এ শিক্ষানবিশ কেরানি হিসেবে আমি যোগ দিতে পারি। কিন্তু, যত দ্রুত সম্ভব সেই ফার্ম আমি ছেড়ে দিই, এবং যোগ দিই একটা সংবাদপত্রে। আমার ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেল এভাবেই। এটা পুরোপুরি ছিল আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ, এবং পরবর্তীকালে তা নিয়ে অনুশোচনা করারও কোনো কারণ ঘটে নি।

সময়টা ১৯৪৪ সাল, এবং তখনকার দিনে একজন সাংবাদিকের মাইনে ছিল খুবই কম। আমার মাসিক আয় সাকুল্যে দাঁড়াত তিরিশ টাকার মতো, যেটা খুবই নগণ্য ছিল ওই চারের দশকের পক্ষেও, যখন কি-না এক টাকায় লোকে কিনতে পারত প্রায় কিলো দুয়েক ইলিশ মাছ, বা তারও অর্ধেক খরচে সুপক্ক চারটে ল্যাংড়া আম। এবং ওই খান তিরিশেক টাকাও এমনকি নির্দিষ্ট দিনে হাতে পেতাম না। সেদিনের কথা আমার আজও মনে পড়ে যখন আমাদের সেই কাগজের মালিককে অনেক বুঝিয়েও শুধু এটুকু আমি রাজি করাতে পেরেছিলাম যে, আমার মাইনের টাকাটা অন্তত দেড় টাকার কিস্তিতেও আমাকে দিয়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু এরই পাশাপাশি আবার কিছু সাহায্য-সহমর্মিতার জায়গাও ছিল। আমার সহকর্মীরা ছিলেন খুবই সদাশয়, এবং নিজেরাই খুব ব্যগ্র হয়ে থকতেন আমাকে সাহায্য করার জন্য, যখনই সমস্যায় পড়েছি। একদল অদম্য মানুষ, তাঁদের কয়েকজন যুবক, কয়েকজনের বয়স আবার একটু বেশি— দে সিম্‌স টু নো দেয়ার ওয়ে এবাউট। কথায়-কথায় সূক্ষ্ম মজা আর

দুষ্টুমির তো শেষ ছিল না, সব সময় তাঁরা যেন টগবগ করতেন স্ফূর্তিতে, এমনকি যখন কাজের চূড়ান্ত ব্যস্ততা তখনও যেন মেতে থাকতেন কাজ ও নিজেদের নিয়ে। এমন নয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের কোনোই সমস্যা ছিল না। সমস্যা অবশ্যই ছিল, ক্রমে তাঁদের সেগুলোও আমি জানতে পেরেছিলাম, এবং যে-সমস্যাটা প্রতেকের ক্ষেত্রেই ছিল সেটা হলো, নিজের শরীর ও মনকে সতেজ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের লড়াই। বিকেলে এক কাপ চা বা সস্তার সিগারেটের একটা প্যাকেটও তাঁদের অনেকের কাছেই বিলাসিতা মনে হতো, কারণ ওই সংগতিটুকুও তাঁদের থাকত না। কিন্তু, সেই তাঁরাই যে-উৎসাহ নিয়ে, আফ্রিকার যুদ্ধে রমেল-এর কৌশল বা মন্টগোমারির অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তর্কাতর্কি করতেন, তা দেখলে কারো মনে হতেই পারত যে, এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ভাবার মতো কোনো সমস্যাই নেই। থাকলেও সেগুলোকে এঁরা পাত্তাই দেন না।

এই সমস্ত মানুষগুলোর সঙ্গেই তখন কাজ করতাম আমি। তখনও পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম না যে, প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ার ঘটনা বাস্তবে আদৌ ঘটতে পারে। ভাবতাম ওই-সব 'লাভ এট ফার্স্ট সাইট' শুধু 'বারবারা কার্টল্যাণ্ড'-এর উপন্যাসেই পড়তে পাওয়া যায়। অথচ সংবাদপত্রের মুখর, উজ্জ্বল, যৌবনোচ্ছল ওই জগতে প্রথমবার ঢুকেই কিন্তু আমি সেটার প্রেমে পড়ে গেলাম। সর্বত্র সেখানে একটা প্রত্যাশার বাতাস বইত, বা সেই রকমই অন্তত আমার মনে হয়েছিল। এমনকি ছাপার কালির যে-উগ্র-গন্ধ, ছাপার ফোনিক্স মেশিনের যে-কান-ফাটানো-আওয়াজ তা-ও খুব ভালো লাগত আমার। এবং যে-মানুষগুলো সংবাদপত্র-সম্পাদনার নানা কাজে নিযুক্ত— তাঁদের পাশাপাশি ছাপাখানায় যাঁরা সময় ধরে কাগজ ছেপে বের করার দায়িত্ব সামলাতেন— তাঁদের সকলকেই খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমি। মনে হতো (সংবাদপত্রের দপ্তরে না) আমি বাড়িতেই আছি।

কয়েকটা মাস কাজ করার পর সেই 'বাড়িটা'ই যে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, তার দোষ আমার না। কাগজটা আসলে অনেকদিনই ডাহা লোকসানে চলছিল, এবং মালিকও তাই একদিন স্বাভাবিকভাবেই সেটা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, বন্ধ হলো অফিসের দরজা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যদিও আমরা সকলেই চাকরি খোয়ালাম, তবু, কারো মাথাতেই কিন্তু আকাশ ভেঙে পড়ল না। সেটা ছিল যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের কারণেই কিছু লোকের পকেট হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। তাঁরা যে-সব পথে সেই টাকা আয় করছিলেন, তাকে ঠিক 'উপার্জন' বলা যায় না। এবং তাঁরা চাইছিলেন সেই-সব টাকার একটা অংশ বাজারে লগ্নি করতে।

কিন্তু, এত কিছু থাকতে কেন যে সংবাদপত্রের জগৎটাকেই তাঁরা লগ্নির ক্ষেত্র হিসেবে সে-সময় বেছে নিয়েছিলেন, তা আজও আমাকে ধাঁধায় ফেলে। কিন্তু তেমনটাই করেছিলেন তাঁরা। ফলে একদিকে যেমন কিছু সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনই কিছু দিন অন্তর-অন্তর একটা করে নতুন সংবাদপত্রের জন্মও হচ্ছিল, এবং সেই কারণেই একেবারে

চাকরি-লোপ কারো ক্ষেত্রেই ঘটছিল না সেভাবে। সত্যি বলতে কী, ওই সময়টায় যেন জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছিল একজন সাংবাদিকের একটা চাকরি যাওয়া আর, অন্য-একটা চাকরি পাওয়া। যেমন আমার ক্ষেত্রে বলি, সে-সময় মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যেই অন্তত পাঁচটা সংবাদপত্রে আমার কাজ করা হয়ে গিয়েছিল। কখনো হয়তো রিপোর্টিং-এর কাজ করেছি, কখনো করেছি সম্পাদনার কাজ, আবার কখনো-বা দুটোই করেছি একসঙ্গে—যেমনটা তখনকার দিনে ছোটো মাপের সংবাদপত্রগুলোয় হামেশাই করতে হতো।

এবং এই-সবের মধ্যে দিয়েই যেতে-যেতেই আমি ক্রমশ কাজ শিখে নিচ্ছিলাম। শিখে নিচ্ছিলাম কী করে প্রুফ-সংশোধন করতে হয়, কী করে একটা তথ্য থেকে খবরের দিকে এগোতে হয়, কেমন করে একটা 'স্টোরি' মনোগ্রাহী করে তোলা যায়, কিভাবে তা অনুবাদ করে নিতে হয় এবং কী কায়দায় কোনো খবরের জন্য একটা শিরোনাম ঠিক করতে হয়, যেটা একইসঙ্গে যথাযথ ও আকর্ষণীয় হবে।

তখন আমার বয়েস বাইশ বছর। আমার কাজটা সত্যিই ভালবেসে করতাম আমি, আনন্দে থাকতাম।

এই সময়েই সেই মানুষটার সঙ্গে আমার আলাপ হলো যিনি আমাকে এতটাই প্রভাবিত করলেন, যেমনটা হয়তো ওই জগতের আর কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না।

তখন একটা নতুন সংবাদপত্রে ['ভারত' পত্রিকা] আমি যোগ দিয়েছিলাম যার নিউজ ডেস্ক-এর দায়িত্বে ছিলেন ওই মানুষটি [অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৯০-১৯৬২): বাংলা সংবাদপত্রের রচনাপদ্ধতি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম এই পথিকৃৎ ১৯২৫-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রথমে *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ও পরে *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে *ভারত* পত্রিকায় চলে যান। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সক্রিয় তাঁর সাংবাদিক-জীবনের নানা পর্যায়ে *যুগান্তর*, *কৃষক*, ও *লোকসেবক*-এর মতো একাধিক বাংলা দৈনিকের দায়িত্ব সামলেছেন ক্রমান্বয়ে]। আমার বিগত সংবাদপত্রের জন্য যে-সব প্রতিবেদন লিখেছিলাম তার মধ্যে কিছু-কিছু যেমন তিনি দেখেছিলেন, তেমনই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কিছু কবিতাও তার আগে তিনি পড়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু ওই দুইয়ের কোনোটাই যে তাঁর বিশেষ ভালো লাগে নি, সে-কথাটা সোজা বলে দিলেন চোখে চোখ রেখে। বললেন: তোমাকে যেটা বলতে চাই তা হলো, যে-ধরনের সাংবাদিকতা এতদিন তুমি করছিলে সে-সব তোমার কবিতার মতোই নির্জীব ও পানসে।

(বলাই বাহুল্য) আমি খুবই আহত হয়েছিলাম, কিন্তু তা'বলে মেজাজ হারিয়ে ফেলি নি তাঁর কথায়। তাঁকে বললাম: আপনার কি কখনো মনে হয় নি, কবিতা হয়তো ঠিক আপনার বিষয় না? আপনার সংবাদপত্রের জন্য আমাকে যা লিখতে হবে কোনোভাবেই সেটা কবিতা নয়, এবং সেই কারণেই আমার সাহিত্যসৃষ্টি বিষয় কোনো আলোচনা আপনার সঙ্গে করার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু যেটা জানতে ইচ্ছা করছে, যদি আমার সংবাদ-প্রতিবেদনগুলো আপনার পানসে মনে হয়ে থাকে তবে আমাকে আপনি চাকরি দিতে গেলেনই-বা কেন?

তিনি তাকালেন আমার দিকে, মনে হলো যেন একটা ভূতুড়ে হাসি খেলে গেল তাঁর চোখে, এবং তিনি উত্তর দিলেন: আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলল উন্নতি করার সম্ভাবনা তোমার আছে। সেই কারণেই (চাকরি দিলাম)।

একজন অত্যন্ত কঠোর শিক্ষকের মতো পরের দু'মাস তিনি আমাকে প্রচণ্ড খাটালেন। সেই পর্যায়ে এমন অনেক ব্যাপারই আমার কাছে 'ভ্রান্ত' প্রতিপন্ন করে দিলেন, যেগুলো আমি তার আগে শিখেছিলাম 'ঠিক' বলে। আমার জমা দেওয়া প্রতিবেদনগুলো ছাপতে দেওয়ার আগে দেখলাম নিজে পুনর্লিখন করতেন গোটাটার। আমার স্টোরিগুলো পুনর্বিন্যাস করতেন, বদলে দিতেন শিরোনাম। কঠিন ভর্ৎসনা করতেন আমার যে-কোনো কাজে সামান্যতম ভুল দেখতে পেলেই। এবং শেষমেশ একদিন যখন নিঃসংশয় হলেন যে, এ-ছেলে সহজে হাল ছাড়ার বান্দা না, আমাকে ডেকে বললেন: দেখো বাছা, এই অবধিই আমি তোমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারতাম। এরপর তুমি সাঁতরে পার হতে পারবে নাকি ডুবে যাবে, তা এখন থেকে তোমারই ওপর নির্ভরশীল।

আমি বললাম, ধন্যবাদ স্যার। বলে যেই উঠতে যাব, উনি আমাকে থামালেন, এবং যে-কথাটা বললেন তা আমি আমৃত্যু ভুলতে পারব না। বললেন, সাঁতার যখন কাটবে বাছা, ঘূর্ণাবর্ত নিয়ে সদাসতর্ক থেকো।

জিজ্ঞেস করলাম, কোন ঘূর্ণাবর্তের কথা বলছেন আপনি, স্যার?

তিনি বললেন: ঘূর্ণাবর্ত অজস্র রকমের। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা যেমন—সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (collective noun)। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ধরো, 'মানবজাতি' কথাটা। সংবাদ-প্রতিবেদনে বা তোমার কবিতাতেও কথাটা তো প্রায়শই ব্যবহার করো। কিন্তু, আদতে অর্থ কী এটার, বা এটা কী উদ্দেশ্য সাধন করে বলো তো? 'মানবজাতি' বললে কোনো-একটা মুখ বা কোনো-একটা ছবি কি আমাদের সামনে ধরা দেয়? কিংবা, তোমার মনে পূর্বপরিচিত কোনো ব্যক্তি বা পূর্বদৃষ্ট কোনো বস্তুর স্মৃতি জেগে ওঠে কি? না, তেমনটা হয় না তো। তাহলে তুমি কী করো সেক্ষেত্রে? তুমি ওই সমষ্টিবাচক বিশেষ্যকে ভেঙে ফেলো, কারণ যতক্ষণ তা তুমি না করছ ততক্ষণ সেই পুরুষ ও নারীমুখগুলো তুমি আবিষ্কার করতে পারছ না যাদের নিয়েই ওই 'মানবজাতি' তৈরি, অথচ যাদেরকেই ওই 'মানবজাতি'-র তলায় চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে অত্যন্ত সুচতুরভাবে। 'মানবজাতি' বিশেষ্যটা খুবই অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনহীন; এবং মূলত রাজনীতির কারবারিরাই এই ধরনের গালভরা শব্দ ব্যবহার করে যার কি-না আদতে কোনো গুরুত্বই নেই, অথচ যা তাদের শ্রোতৃবর্গকে প্রভাবিত করবে। রাজনীতিকরা সবসময় হাহুতাশ করবে ওই অর্থহীন, অস্পষ্ট 'মানবজাতি'-র জন্য, কিন্তু কখনোই এক বিন্দু চোখের জলও ফেলবে না সেই ব্যক্তি-মানুষটার জন্য যাকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়, এবং একক অস্তিত্বের পাশাপাশি যার একটা অর্থপূর্ণ পরিচয় আছে।

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন, কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলেন একটু, তারপর

আবার বললেন: তুমি নিশ্চয় ভাবছ আমি বক্তৃতা করছি, কিন্তু মোটেই করছি না তা। বলতে চাইছি এই ধরনের সমষ্টিবাচক বিশেষ্যগুলো সবসময়ই একজন বিচক্ষণ পাঠককে হতাশ করবে। তাঁর সময়ও নেই এই-সব পড়ার, কারণ এগুলো তো তাঁর কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। আজকে, আমাদের সংবাদপত্রেই ছোটো একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে— সম্ভবত তোমারই লেখা— যেটা আমাদের পাঠককে জানাচ্ছে যে, আমাদের এই শহরেই গত রাত্রে একটা লরি দু'জন ব্যক্তিকে চাপা দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু এটুকু সংবাদই কি তথ্য সম্পর্কে পাঠকের খিদে মেটাতে পারে? পাঠক জানতে চাইবে সেই দু'জনের পরিচয় কী, তাঁদের বয়স কত, তাঁদের জীবিকা কী ছিল, তাঁরা বিবাহিত ছিলেন কি-না, তাঁদের ছেলেপুলে ছিল কি-না, এবং তাঁদের পরিবারে তারাই একমাত্র অর্থোপার্জন করতেন কি-না। এবং, ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করে আর কখনো তুমি ওই 'ব্যক্তি' শব্দটা ব্যবহার কোরো না। ওইটা অত্যন্তই নির্জীব, অনির্দিষ্ট, দূরত্বব্যঞ্জক একটা শব্দ। তুমি একজন উষ্ণহৃদয় যুবক। সুতরাং তোমারই তো বোঝা উচিত যে 'ব্যক্তি' বলে এ-পৃথিবীতে কেউ থাকে না, থাকে কেবল পুরুষ এবং নারী। আশা করব এটা মনে থাকবে তোমার। এবং এবারে আমার একটা উপকার করো— দয়া করে বিদেয় হও, আর আমার কাজগুলো শেষ করতে দাও আমাকে।

আমি যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলাম। তাঁর সেই কথাগুলো একজন শিক্ষানবিশ সাংবাদিকের পক্ষে যতটা অব্যর্থ ছিল, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল একজন উদীয়মান কবির পক্ষেও।

এটা ঠিক যে, কোনো সংবাদপত্রই বলতে পারবে না, ওঁর মতো লোক হাজার একটা আছে তাদের অফিসে। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, আমাদের বাংলা সাহিত্যজগতেও ওঁর মতো গুরু বেশ বিরল। এবং আমি অন্তত এই সত্যটা বেশ ভালোই জানি, কারণ (সংবাদ ও সাহিত্য) দুটো জগতেই আমার প্রায় চল্লিশটা বছর অতিক্রান্ত।

আমি এটাও নিশ্চিতভাবেই জানি, জীবনের শুরুতেই ওই মানুষটার সান্নিধ্য না পেলে শুধু আমার সাংবাদিকতার না, উপরন্তু কবিতা লেখারও অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। কারণ তিনিই প্রথম একটা বড়ো সত্যের ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, যেটা ছাড়া কিছুই হতো না। যদিও পরোক্ষভাবে, তবু তিনিই তো আমাকে বুঝিয়েছিলেন, যে-কোনো আরোপিত মতাদর্শ— তা সে যত বড়োই হোক-না-কেন, বা যে-কোনো আরোপিত দর্শন— তা সে যত শক্তিশালীই হোক, আমাদের লেখাকে তা দুর্বল ও পঙ্গু বানায়; সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে এটা যেমন সত্য, তেমনই সত্য কবিতা লেখার ক্ষেত্রেও।

এক বন্ধু সম্প্রতি এই অভিযোগ করেছেন যে, আমার কবিতার জগৎ মূলত দখল করে আছে ব্যক্তি-এককেরই আনন্দ ও বেদনা। যার ফলে আমার কবিতায় দেখা মেলে না সেই বৃহত্তর মানব পরিবারের যাকে আমরা বলি 'মানবজাতি'। আমার মনে হয়, তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে, আজও নির্দিষ্ট কোনো একটা রাজনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক ভাবধারায় আমার বিশ্বাসকে আমি স্থিত করতে পারলাম না, যে-ভাবধারা মানুষকে তাঁর যাবতীয় বন্ধন

থেকে মুক্তির ও ব্যাধি থেকে আরোগ্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

তা যদি হয়, তো তা-ই। আমি সে নিয়ে চিন্তিত না। কারণ আমি জানি যে, যদি অন্য কেউ অন্য কোনো দিন আমার কবিতাকে (আমার ওই বন্ধুর থেকে) অন্য কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করে— দ্বিতীয় যে-ব্যাখ্যার্থ আমার কবিতার শরীরেই বহমান— তবে সেই ব্যাখ্যাকেও আমার কবিতারই অন্তর্জাত হতে হবে, কোনোভাবেই বাইরে থেকে আমার কবিতাতে 'আরোপিত' কিছু হতে পারবে না তা।

আর সে-কারণেই আমি যেমন, তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। যে-সব নারী ও পুরুষদের আমি দেখেছি, জেনেছি— তাঁদের আজও আমি ভালোবাসি, আজও ব্যক্তি-একক হিসেবে তাঁদের যে-পরিচয় ও মৌলিকতা তাকে আমি সম্মান করি। আজও অল্পস্বল্প সাংবাদিকতার কাজ করছি, এবং আমার কাব্যসৃষ্টিধারা অব্যাহত আছে আজও।